'অমনিবাস মাসিক পত্রের পাঁচমিশেলি ভিড়ের মধ্যে সত্যিকারের ভালো কবিতাও কেমন একটা বাজে ও তুচ্ছ চেহারায় হারিয়ে যায়। কবিতাকে যথোচিত গৌরবে বিশেষভাবে ছেপে থাকে এমন সাময়িক পত্র বর্তমানে দেশে বেশি নেই। অথচ আধুনিক কবিদের অনেকেই নতুন কবিতা লিখছেন - বাইরের পাঠক - মণ্ডলী দূরে থাক সব সময় নিজেদের মধ্যেও সেগুলো দেখাশোনার সুবিধে হয় না।' 'বিচিত্রা' পত্রিকার (১৩৪২ কার্তিক) 'নানা - কথা' বিভাগে বিজ্ঞাপনপ্রতিম এই পত্রটিতে তদানীন্তন দু-জন প্রধান আধুনিক কবি বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাক্ষর থাকলেও, এখন থেকে প্রায় বছর সত্তর পূর্বে সে - সময়ের তরুণ কবিদেরই সামগ্রিকঅসুবিধার কথা উত্থাপিত হয়েছিল। কেন যে তরুণরা, চলতি সাময়িক পত্রে তাঁদের কবিতা ছাপতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তারও একটা আঁচ পাওয়া যার অবশ্য, আর এই অনিচ্ছা যে অন্যায় নয় বরং সঙ্গত, সে কথা লেখকরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণাও করেছিলেন। আধুনিক বাংলা কবিতার যথার্থ প্রচারের ক্ষেত্রে এরকম কিছু সমস্যার ভিতর থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল বহুখ্যাত সেই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির। বাংলা কবিতা বিষয়ে সমকালীন পাঠক ও সম্পাদকবর্গের অবজ্ঞা আর অস্বীকৃতির মনোভাবের প্রতি একটা স্পষ্ট বিদ্রোহ জানাতে চাইছিলেন প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদকেরা, এবং একথা স্বীকার করতেই হয় 'কবিতা' দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, তার সবচেয়ে বড়ো কারণ 'কবিতা' কেবল নিজেদের কাব্যপ্রতিভা স্ফুরণের বাহক হয়ে উঠুক তা তাঁরা চাননি। কেবল বাংলা কবিতার আধুনিকতা ত্বরান্বিত করা নয়, তার প্রতিষ্ঠাকেও সর্বজনমান্য করে তোলার জন্য তাঁরা একটা সামগ্রিক প্রচেষ্টার উদ্বোধন দেখালেন সাময়িক পত্রের ইতিহাসে।

উক্ত পত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পত্রলেখকগণ সগৌরবে জানিয়েছিলেন, 'আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিরা এতে তাঁদের রচনা প্রকাশ করবেন। নবীন কবির ভালো কবিতাও যতটা পাওয়া যায় প্রকাশিত হবে।' এই উদ্ধৃতি অংশে ব্যাপারটা স্পষ্ট, 'কবিতা'র উদ্যোগীরা সমকালীন কবিদের অন্তত দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন, যাঁদের একটা অংশে 'আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিরা' রয়েছেন, অন্য অংশে 'নবীন কবিরা' - এই শেষোক্ত দল তখনো সঠিক অর্থে পাদপ্রদীপের সামানে আসেননি। পরবর্তী পাঁচ - দশ বছরব্যাপী এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবিদের উত্থান লক্ষ করা যায় 'কবিতা'র ছত্রছায়ায়, এদিক থেকে নতুন ধরনের কবি ও কাব্যচর্চার প্রচারে বুদ্ধদেব বসুর ভূমিকা নিঃসন্দেহে স্মরণযোগ্য। বলতে গেলে তিনি শুধু নিজেই নতুন ধরনের লেখার চেষ্টা করে, কিংবা তা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, সাহিত্যে যা তাঁকে আনন্দ দেয় তাতে অন্যেরাও আনন্দিত হোক এই ছিল তাঁর একান্ত বাসনা, অন্তত ছাপার অক্ষরে 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রিকার প্রকাশসময় থেকে, খুব গভীর ভাবে তিনি কাব্যপ্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে যখন তিনি মাত্র উনিশ বছরের যুবক। পরিণত বয়সে তাঁর যৌবনের প্রচারকের ভূমিকা স্মরণ করে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন 'আমারর এই বৃত্তিটি নির্বাধ ছাড়া পেলো 'কবিতা' বেরোবার পর, কেননা, তখনই একের পর এক দেখা দিচ্ছেন নানা বয়সের নতুন ধরনের কবিরা, দেখা দিচ্ছেন বা প্রাপ্ত হচ্ছেন পরিণতি - বাংলাভাষায় কবিতা লেখা কাজটি হয়ে উঠছে শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাশাপূরণের উপায় নয়, রীতিমতো একটি 'আন্দোলন', যার মুখপাত্ররূপে চিহ্নিত হয়েছে 'কবিতা' পত্রিকা। বুদ্ধদেব তাঁর আলোচ্য স্মৃতিকথায় এও জানিয়ে ছিলেন 'জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী; দ্বিতীয় দফায় সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়; - প্রথম দশ বছরে যারা পর্যাপ্তভাবে প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছেন 'কবিতা'য়; আর তারপর তৃতীয় কিস্তির নরেশ গুহ, অরুণ সরকার।' একথা অস্বীকার করার উপায় নেই 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই পাঠকসমাজ, 'কবিতা নামক একটি পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে' অনেক বেশি সচতেন হয়েছিলেন এবং সম্পাদকরাও কবিতাকে পৃথক মর্যাদা দিতে সুরু করেছিলেন, বুদ্ধদেব একদা ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশের উপলক্ষ জানাতে গিয়ে বলেছিলেন 'সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শুধমাত্র কবিতাকে প্রধান্য দেবার প্রয়োজন ছিল, নয়তো সেই উঁচু জায়গাটি পাওয়া যেতনা, যেখান থেকে উপেক্ষিত কাব্যকলা লোকচক্ষুর গোচর হতে পারে।' দেখা গেল, একদিন নিছ ক পাদপূরণের কাজে ব্যবহৃত পদ্যজাতীয় রচনাকে, গদ্যভোজের এঁটো পাতে সংকোচে কোনোরকম স্থান করে নিতে হত যাকে, এবং বাছাইয়ের মাপকাঠি ছিল 'ইঞ্চিমাপা স্কেল' - এমনকী নাম জানা কবিদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বুদ্ধদেব পুরোনো দিনের সেই দুঃসময়ের প্রসঙ্গ তুলে জানিয়েছিলেন /প্রবাসী'র কোনো - কোনো সংখ্যায় সত্যেন্দ্র দত্তের পাঁচটি - ছটি করেও কবিতা পাওয়া গেছে, কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে, ডবল - কলমের ঠেলাঠেলির মধ্যে কখনো মনে পড়ে না আস্ত পাতাটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বড়োজোর আমিষান্নের ফাঁকে ফাঁকে চাটনির মতো পরিবেশন, কিন্তু কবিতাটাই একটা ভোগ্য বস্তু এমনভাবে কোথাও নেই।' শুধু কবিতার জন্য আলোচ্য পত্রিকাটি বাংলা কবিতার জন্য যে মঞ্চটি প্রস্তুত করে দিয়েছিল, তাতে এই প্রথম দেখা গেল 'অন্নিবাসের বদলে একেবারে রিজার্ভ করা সেলুন গাড়ি' - 'অন্য কারো জায়গাই নেই সেখানে।' 'বিচিত্রা' পত্রিকাতেও এই নতুন ত্রৈমাসিকটির চারিত্র্য ধূর্জটিপ্রসাদকেও প্রথম দর্শনে আকৃষ্ট করেছিল - তিনি প্রথম সংখ্যাটির সমলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন 'এমন সুন্দর ছাপান ওবাঁধান কোন পত্রিকা হাতে পড়লে প্রাণটা খুশী হয়ে ওঠে। তার উপর বিষয় হোল কবিতা; কেবল কবিতা; হিন্দু দর্শনের চাল, আবিসিনিয়ার অসভ্য জাতির বর্ণনার ডাল এবং গল্পের আনাজ মিশিয়ে জগাখিচুড়ি নয়। কলাপাতার উপর বাসমতী চালের ভাত কেবল, গন্ধেই খিদে আসে, জোর একটু গাওয়া ঘির প্রয়োজন হয়, না হলেও চলে।' স্মরণ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথও 'কবিতা' পত্রিকার উদ্যোগে অকুণ্ঠ আর্শীর্বাদ জানিয়ে মন্তব্য করেছিলেন 'তোমাদের পত্রিকা নতুন কবিদের খেয়ার নৌকো। যাদের হাতে উপযুক্ত মাশুল আছে তাদের পার করে দেবে সর্বজনের পরিচয়ের তীরে।'

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম বছরে চারটি সম্পাদকীয় রচনায় বুদ্ধদেব বসু কবিতার প্রধান সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সেগুলি যথাক্রমে 'কবিতার দুর্বোধ্যতা', 'আধুনিকতার মোহ', 'গদ্যছন্দ', 'কবিতার পাঠক'। শেষোক্ত রচনায় তিনি লিখেছিলেন 'পৃথিবীতে ভালো কবির সংখ্যা অল্প, ভালো পাঠক সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এ পর্যন্ত, অন্তত কবিতার ইতিহাস এই রকমই সাক্ষ্য দেয়। একটা কথা আছে, কবি হয়ে জন্মাতে হয়; কবিতার পাঠক হয়েও জন্মাতেই হয় হয়তো। এটা মনের একটা বিশেষ বৃত্তি; যার থাকে না তার থাকে না। যেমন অনেকে বর্ণান্ধ হয়ে জন্মায়, তেমনি অনেকে জন্মায় কবিতাবধির হয়ে - দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যা ঢের ঢের বেশি।' সম্পাদকের লক্ষ ছিল, আধুনিক কবিতা যে - সব নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজ পাঠকের দরবারে উপস্থিত, পাঠকের সঙ্গে তার যোগাযোগ না করালে কবিতা চিরদিনই দুর্বোধ্য থেকে যাবে। যে কোনো নতুন রূপকে সনাতনপন্থীদের পক্ষে মেনে নেওয়া প্রথমে অসুবিধা হয়। কিন্তু কালক্রমে যুক্তি তর্ক দিয়ে গ্রহণ করলে আধুনিকদের প্রচলনের পথটা পাঠকের কাছে সহজগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বুঝেছিলেন 'কবি তৈরি করা যায় না, কিন্তু অনুকূল অনুষঙ্গে কবিতার পাঠ ক তৈরী হতে পারে। ভালো পাঠকের সংখ্যা অল্প, কিন্তু বাড়ানো যেতে পারে এবং ভালো পাঠক যত বেশি হয়, কবির ও কবিতার পক্ষে ততই ভালো।'

প্রথমবর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় 'শ্রেষ্ঠ উপহার' শিরোনামে একটি অভিনব বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলেন বুদ্ধদেব। সেই বিজ্ঞাপনথেকে বোঝা যাবে আধুনিক কবিতার পাঠক তৈরির কাজে সম্পাদক কী অদম্য উৎসাহ পোষণ করতেন। সেই অভিনব পরিকল্পনাটির উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছিলেন 'নববর্ষে ও পূজায়, জন্মদিনে ও বিবাহে ও আরো কত মধুর ব্যক্তিগত উপলক্ষ্যে প্রিয়জনদের মধ্যে উপহারের আদান - প্রদান প্রচলিত। কী উপহার কিনবেন এই ভাবনায় আপনি কতবারই না উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছেন। আপনি বোধহয় কখনো ভেবে দেখেননি যে বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপহার - এবং সবচেয়ে সস্তাও বটে। মাত্র দেড় টাকা খরচ করে আপনার প্রিয় জনকে এক বছরের 'কবিতা' উপহার দিলে আপনি যেমন তৃপ্তি পাবেন ও তিনি যেমন খুশি হবেন তেমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। 'কবিতা' ত্রৈমাসিক পত্র হলেও বছরের শেষে এক সঙ্গে বাঁধানো আধুনিক কবিতার একটি চমৎকার চয়নিকা হয়ে দাঁড়াবে। সে-বই হবে রাখবার মতো। ভালো কবিতা প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ উপহার, সেই উপহারই আপনি দিন।'

মনে পড়ছে, 'কবিতা' পত্রিকার পাতাতেই এক অভিনব আন্দোলনের খবর পড়েছিলাম, পথচারীদের সচকিত করে দিয়ে শনিবারের অফিস ফেরত জনতার ভিড়ের সামনে যুবকরা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'কবিতা পড়ুন! কবিতা না পড়লে বাঙালি বাঁচবে না।' এসপ্লানেড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এরকম দু'টি সভার উল্লেখ করেছিলেন প্রতিবেদক। শোনা যায়, সে সময় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক বিদ্রুপ প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদপত্রে, কবিতাকে যারা চিরদিন স্বর্গীয় বস্তু বলে ভ্রম করে এসেছিলেন, ভালোবাসার নামে কবিতাকে কেবলই কাল্পনিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে তৃপ্তিবোধ করতেন, তাঁদের আপত্তি সোচ্চার হয়ে ইতিপূর্বে কবিতা ভবনের উদ্যোগে যখন 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালা প্রকাশ করে সম্পাদক বুদ্ধদেব আধুনিক কবিতার প্রচারে অভিনব পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, সনাতনপন্থীরা সহজে মেনে নেননি, বরং ব্যঙ্গ করেছিলেন তাঁরা, বিশেষত 'শনিবারের চিঠি' লিখেছিল 'আধুনিক কবিকুল যে দো - দো পয়সা দামের সূঁচ মাথার কাঁটা অথবা হাতেমাটি সাবানের চাইতেও সস্তায় কবিতা ছাড়িতে পারিতেছেন, সমাজের পক্ষে ইহা কম কল্যাণকর নয়।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এই সুলভ গ্রন্থমালা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রকাশক জানিয়েছিলেন 'এই নামটিতে কিছু বিদ্রুপ, কিছু হয়ত ঔদ্ধত্য আছে - তা থাক। কিন্তু নামটির সার্থকতা এইখানে যে ষোলো পৃষ্ঠার একটি বই সুন্দর মলাট দিয়ে চার আনা মূল্যে প্রকাশ করা হবে। একটি সম্পূর্ণ কবিতার বই চার আনা মূল্যে যে কোন শ্রেণীর পাঠকই অনায়াসে কিনতে পারবেন) একথা মনে রেখেই আমাদের উদ্যম।' নাম মাত্র মুল্যে, এই যে কাব্যগ্রন্থ প্রচারের উদ্যম তা কেবল হুজুগের আতিশয্যে হারিয়ে যায়নি, তথ্য হিসেবে এ ঘটনার উল্লেখযোগ্যতা স্বীকার করতে হয়। সকলেই জানেন, তখনকার প্রায় প্রত্যেক প্রধান কবির কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এই পরিকল্পনার অর্ন্তভুক্ত হয়ে, বিশেষত 'বনলতা সেন' নামের বহুবিখ্যাত গ্রন্থটির প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল এই পর্যায়ের ফসল হিসেবেই।

পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় কবিতাকে জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে 'আরো কবিতা পড়ুন' আন্দোলনের সূত্রপাত করেন গৌরকিশোর ঘোষ, অরুণকুমার সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। হয়তো পরে 'কবিতা মেলা'-র মতো যে কর্মকান্ড সংগঠিত হয়েছিল তাতেও এঁদের কেউ কেউ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কবিতাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনেও তরুণ কবিদের অনেক উদ্ভট কাজকর্ম পরিকল্পিত হয়েছিল। মার্কাস স্কোয়ারে 'কৃত্তিবাস' - এর তরুণ লেখকরা একটি দোকান দিয়েছিলেন 'অতি আধুনিকতা। পণ্য স্বপ্ন।' গোলাপি কাগজে ছাপা পাঁচ পয়সা মূল্যের কবিতা বিক্রি হয়েছিল - এক এক পৃষ্ঠায় শুধু এক জনের কবিতা। কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁদের যৌবনের দিনগুলিতে পরপর কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে অনেক পরে লিখে ছিলেন কবি আর পাঠকের সংযোগের জন্য নতুন সম্ভাবনার পথও কি খোঁজা হচ্ছিল ? আমাদের মনে পড়বে কলকাতার পথে পথে 'আরো কবিতা পড়ুন' -এর খ্যাতি নিয়ে কবিদের আন্দোলন এরই সমসাময়িক ঘটনা মনে পড়বে 'কৃত্তিবাস' - এর প্রথম সংখ্যাতে'কাব্যসভা' নামে একটি প্রতিবেদন লিখছেন তরুণ সম্পাদক সুনীল। লিখেছিলেন, যে এই সভা আত্মকেন্দ্রিক কবিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকতে সাহায্য করবে, সব কবিকেই এই সভা আহ্বান করবে আবৃত্তি আর আলোচনার জন্য। প্রস্তাবিত কাব্যসভা হয়তো খুব বেশিদূর এগোয়নি আর, কিন্তু এরই অল্প পরে দেখা দিয়েছিল সেনেট হলের দু-দিনব্যাপী ঐতিহাসিক সেই কবি সম্মেলন যে - সম্মেলনের সফলতার পর আজ তিন দশক জুড়ে প্রকাশ্য কাব্যপাঠ আমাদের সংস্কৃতি চর্চার প্রায় এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠল। জীবনানন্দ ছাড়াও এই রকম উদ্যোগে আর যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব ছাড়াও ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, অশোকবিজয় রাহা, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন প্রমুখ কবি। কামাক্ষীপ্রসাদের একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এই প্রকল্পনায়। এই প্রকল্পের যাবতীয় মুদ্রণ ব্যয় সংশ্লিষ্ট কবিরাই বহন করতেন, বুদ্ধদেবের দায়িত্ব ছিল প্রচারের, বিক্রয়ের - একটা বিষয় লক্ষণীয় সকলে যে সহজে এই ব্যয় বহন করতে পারতেন তা নয়, যেজন্য অনেকেই এতে অংশ গ্রহণ করেননি। আবার প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতেন এত সহজে পক্ষে জড়িয়ে হয়ত কবিতার গৌরবের দিকটা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। বুদ্ধদেব অবশ্য সকলকে কীভাবে উৎসাহ দিতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষ্ণু দেকে একটি পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন 'আপনার তো অনেক নতুন কবিতা হলো, -এ বার এক ভল্যুম 'এক পয়সায় একটি' বের করুন। সিরিজটা লোকে খুব পছন্দ করছে, পরপর আরো কয়েকটা না বেরলে সুর কেটে যাবে।' অবশ্য বিষ্ণু দে সম্মত হননি। অন্নদাশঙ্করের কাছে পরিহাস করে বলেছিলেন পাঠকরা এক পয়সা দিয়ে নিয়ে যাবে এক একটা বই তাতে বুদ্ধদেব বাবুর তো অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

'কবিতা পড়ুন' আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করে সনাতনপন্থীরা যখন আশঙ্কা করেছিলেন 'কবিতা'র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এতে, তখন 'কবিতা'র পাতায় প্রতিবেদনকারী প্রশ্ন রেখেছিলেন 'আমি জানিনা, কবিতার জাত কিসে যায়, ফুটপাত নেমে এলে নাকি দোতলা- তেতলা স্কুলে - কলেজে ক্লাস পড়ানো পাশ করানো যন্ত্রের ছিবড়ে হয়ে বেরিয়ে এলে।' যখন তরুণ রক্তের উৎসাহ অধিকাংশই ধাবিত হচ্ছে সিনেমা এবং লারেলাপ্পা প্রমুখ শুঁড়িখানার উপযোগী সঙ্গীতের দিকে, সে সময়ে একদল যুবকের এই কাব্যেন্মাদনার খবরে উৎফুল্ল হয়েছিলেন 'কবিতা'র সম্পাদক। প্রতিবেদনের শেষাংশে, কবিতার সঙ্গে আধুনিক মানুষের প্রধান ব্যবধান যাতে লুপ্ত হয়ে গিয়ে নতুন যোগসূত্র স্থাপিত হয়, সেজন্য তিনি জ্যান্ত কবিতার বাহক হওয়ার জন্য বেতার কেন্দ্রের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে আরও একটি বাড়তি সঙ্গত প্রস্তাবও রেখেছিলেন, 'ইংলণ্ড - আমেরিকার অনুকরনে বাংলা কবিতারই বা রেকর্ড হবে না কেন ?' পরবর্তীকালে বাংলা কবিতার রেকর্ডে তিরিশের অনেক প্রবীণ কবির কণ্ঠস্বর ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছিল, চল্লিশের এবং পঞ্চাশের অনেক নবীন কবিরাও সে আয়োজনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আজকের দিনে ক্যাসেট - সিডিতে যে বাংলা কবিতার বাণিজ্য সাফল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার সেই সূত্রপাত হয়েছিল হয়তো এই মন্তব্য অনুসরণ করেই। আর, রেডিওতে এক সময় কবিতা পাঠের আসর পরিচালনা করতেন পেমেন্দ্র মিত্র, আধুনিক তরুণদের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি যাঁরা তাঁদের অনেককে তিনি ডেকে নিয়ে গিয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু কবিতা প্রচারের ক্ষেত্রে একটা বৃহদাকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সিগনেট গ্রেসের কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্ত। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সিনেট হলে ২৮-২৯ জানুয়ারি দুদিনের সেই কাব্যপাঠের আসর সম্পর্কে 'টুকরো কথা'য় লেখা হয়েছিল 'কলকাতা সেনেট হল্ - এ দুদিনব্যাপী এবার যে আধুনিকপন্থী প্রবীন কবিদের সম্মেলন হয়ে গেল তাতে আশ্চর্য জনসমাগম হয়েছিল। এ থেকে কী সিদ্ধান্ত করা যায় ? ...সেনেট হল্ -এ প্রতিদিন আড়াই ঘন্টা তিনঘন্টা কাল যাঁরা স্থির হয়ে বসে এবং দাঁড়িয়ে - দাঁড়িয়েই হয়তো বেশি - আবৃত্তি শুনেছেন তাঁরা বোধকরি এহেন মন্তব্য শুনে আত্মশ্লাঘা বোধ করবেন না। পরপর দুদিন ৭০ জন কবির অন্তত দেড়শো কবিতা আবৃত্তি শোনাটা ধৈর্য এবং সহ্যগুণের প্রায় অবিশ্বাস্য পরিচয় সন্দেহ নেই। ... তাছাড়া এত বৃহৎ কবি সম্মেলনও বাঙলাদেশে এই প্রথম - তখন দেখবার কৌতূহল, শেখার আগ্রহের চাইতে বেশি হলেও হতে পারে। কিন্তু আধুনিক কবিতা কী করে পড়তে হয়, অন্তত লেখকরা স্বয়ং কীভাবে পড়ার জন্য লেখেন, সেটা অন্তত এই ধরনের সম্মেলন থেকে জানা সম্ভব। এবং সেনেট হলে সম্মেলন এদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়নি। পুস্তকাকারে কবিতা প্রকাশিত থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠাবান শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও যখন এরকম ধারণা প্রচলিত হয়েছে যে আধুনিক কবিতা মানেই ছন্দছুট, গদ্যের অপকীর্তি; তাতে না আছে ভাব, না আছে সুর, না আছে শৃঙ্খলা - তখন আধুনিক কাব্যের আবৃত্তি শোনানোর প্রয়োজন আছে মানতেই হয়।' ওই প্রতিবেদনে আরো জানানো হয় প্রবীণ কবিদের মধ্যে যোগ দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, অচিন্ত্য রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য। শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন অশোকবিজয় রাহা এবং সুনীলচন্দ্র সরকার। এই সম্মেলনের আনন্দস্মৃতি এবং বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা অনেকেই ভুলতে পারবেননা।

'কবিতা' পত্রিকার আবির্ভাব সাল থেকে হিসেব করলে, এই দীর্ঘ প্রায় সত্তর বছরের ব্যবধানে বাংলা ভাষায় পত্র - পত্রিকায় প্রকাশ সংখ্যা বিশেষত কবিতা নির্ভর পত্রিকার প্রাচুর্য দেখলে অবাক হতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের এমন কোনো মফঃস্বল এলাকা নেই যেখানে বাংলা কবিতার এই বিপুল প্রসারমানতার ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়েনি। কবিতা চর্চা করেন অন্তত এমন পাঁচ-দশজন একত্রিত হয়ে পত্রিকা প্রকাশ না করে ক্ষান্ত থেকেছেন এমন উদাহরণ বোধহয় নেই বললেই হয়। অথচ গত বেশ কয়েক বছর ধরে কাব্যচর্চার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিরা সাম্প্রতিক কবিতার ভবিষ্যতের কথা উঠলে একটা সর্বাত্মক হতাশার কথা বলে থাকেন। এত যে অজস্র কবিতার কাগজ, কবিদের সংখ্যাও যে সামান্য নয়, তাতে সত্যিকার কবিতার প্রচার সত্যিই কি কোনো সাফল্যকে স্পর্শ করতে পেরেছে, পরস্পর কবিদের মধ্যে। কিংবা কবিতা প্রেমিকদের ভিতরে মাঝে মধ্যে এ নিয়ে আলোচনাও লক্ষ করা গেছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এক সময় 'এত কবি কেন' মন্তব্য করে একটা বড়ো বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে। সম্প্রতি তারাপদ রায় তাঁর এক স্মৃতি কথায় পূর্বোক্ত সেনেট হলের কবি সম্মেলন প্রসঙ্গেলিখেছিলেন, সেনেট হলের কবি সম্মেলন বাংলা কবিতাকে একটা নতুন গতি দিয়েছিল। 'প্রথমে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপরে পাড়ায়, ক্লাবে, পঁচিশে বৈশাখে একে একে কবি সম্মেলন আয়োজন হতে লাগল।' সেই প্রভাব আজকের দিনে বিস্তৃত হতে হতে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তারও একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি 'কবি সম্মেলন কিন্তু বেড়েই চলেছে। শুধু কলকাতায় নয়, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সহস্র সহস্র কবি যে কোনও রাজনৈতিক দলের ক্যাডারের চেয়ে কবির সংখ্যা বেশি। যেকোনও রেল স্টেশনে, গঞ্জে, শহরে পৌঁছে একটু খোঁজ করলেই এদের দেখা পাওয়া যাবে।' আজকাল একটা প্রবণতা বেশ লক্ষ্য করার মতো তা হল - কবিতার বই প্রকাশ করেন নি, অথচ একটানা অন্তত পাঁচবছর কবিতাচর্চায় লিপ্ত আছেন এমন তরুণ কবির সংখ্যা নিশ্চয় আঙুলে গুণে বলা যায়। মাঝেমাঝে পাঠক হিসেবে একটা প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয় নিজেকে, গত দু-দশকের বহুলপ্রচার বা উল্লেখযোগ্যতার সম্মান পেয়েছে কয়টি কবিতার বই, যেগুলির লেখক বাংলার তরুণ কবিরা, নিদেনপক্ষে সে রকম দশটির নাম উচ্চারণ করতে পারবো আমরা ? অবশ্য আজকাল বড়ো প্রকাশকদের মধ্যে কেউ কেউ কবিতার বই প্রকাশ করার ব্যাপারে অনেকটা উদারতাও দেখাচ্ছেন - অবশ্য সেসব বই যে বাণিজ্য সাফল্যের নিরিখে একটা বড়ো বাজার তৈরি করেছে এমনও কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না।

এ ঘটনা আজকের প্রজন্মের অনেক কাব্য পাঠকদের কাছেঅনেকটা অপরিচিত মনে হতে পারে, 'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে প্রথমে যুক্ত থাকলেও মতান্তরের ফলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্র আদর্শগত কারণে 'কবিতা'-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'নিরুক্ত' নামের একটা কবিতা ত্রৈমাসিক প্রকাশ করেন। সে কাজে রবীন্দ্রনাথকেও তাঁরা তাঁদের সমর্থক হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন প্রথম সংখ্যা থেকেই। প্রথম সংখ্যার (আশ্বিন ১৩৪৭) শেষ পৃষ্ঠায় 'সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তি' - তে তাঁরা মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিলেন। মোহিতলাল তাঁদের জানিয়েছিলেন 'কবিতার প্রতি আর কাহারও আস্থা বা শ্রদ্ধা যে নাই, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যাহারা কবিতা লেখে তাহারা নিজেদের দলের জন্যই লেখে - লেখক ও পাঠক, একই সম্প্রদায়। সাধারণ পাঠক যাহারা তাহারা কবিতা আর পড়ে না। সমাজে কবিতা অচল হইয়া উঠিয়াছে। অথচ এই দেশের এই সমাজে, এককালে হেম নবীন মধুসূদনের গ্রন্থ ঘরে ঘরে দেখা যাইত।' এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকার পক্ষ থেকে এরপরে জানানো হয়েছিল 'বাংলা কাব্যে একটি সুস্থ আন্দোলন প্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাংলা কবিতার একটি পাঠকশ্রেণীও গড়ে তুলতে চাই। 'নিরুক্তে' যেসব কবিতা প্রকাশিত হবে তার ভালমন্দের চিন্তাশীল বিচার আমরা পাঠকের কাছ থেকে সাদরে গ্রহণ করে পরবর্তী সংখ্যায় তা প্রকাশ করব। আমরা মনে করি কাব্যে বীতশ্রদ্ধ পাঠকদেরকে কবিতার প্রতি উৎসাহিত করে তোলার প্রয়োজন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই।'

আমাদের দেশে একটা প্রথার প্রচল লক্ষ্য করার মতো, বিশিষ্ট এবং জনপ্রিয় অগ্রজ কবিদের কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে সাধারণত অনুজ কবিরাই আলোচনা করে থাকেন, সে সবের অনেকটাই জুড়ে থাকে সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও বিনয়। কখনো - সখনো মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিতর্ক উত্থাপিত হয়নি, এমন নয়। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে কোনো খ্যাতকীর্তি পূর্বজের কলমে, তাঁর অনুজ কবির পদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সামগ্রিক বিচারে শোভন, যথার্থ ও প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন হয়েছে বলে মনে পড়ে না। একমাত্র বুদ্ধদেব বসু

তাঁর কবিতা'র পাতায় দীর্ঘদিন পূর্বে এ ধরনের প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেছিলেন। আজকের দিনে, একজন প্রবীণ কবির সঙ্গে একজন অর্বাচীনের বয়সের ব্যবধান বা রচনাগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য শুধু পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার বাধা হয়ে ওঠেনি, ব্যক্তিগত অপরিচয়ের ফারাকটাই বড় ব্যাপক হয়ে উঠেছে। প্রবীণদের উদাসীনতা ও নবীনদের অতি সচেতন অবজ্ঞার জন্যেই সাহিত্যের আধুনিকতা একটা জায়গায় আটকে থাকে; কেননা উত্তরকালের আধুনিকতাকে সানন্দে স্বীকার করে নেওয়াই প্রবীণদের আধুনিক - মনস্কতার শ্রেষ্ঠ নজির, যদি তা স্বীকারও না করতে পারেন মনে প্রাণে, তবু সদ্যতনের নানা রচনার সঙ্গে একটা পরিচিতি থাকা প্রয়োজন, আর পূর্ববর্তী রচনার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত থেকেও নিজেরা কোনো অর্থে আধুনিকতার স্পষ্টতার সঙ্গে পূর্বজদের বোঝাপড়া স্থাপন করতে চান যাঁরা, আধুনিক অনুজ হিসেবে তাঁরা তত বেশি মর্যাদাবান। শেষোক্তদলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, নিজেদের সমকাল ও সমকালীন কবিদের সঙ্গে নিয়েই তাঁদের আধুনিকতার বৃত্তটি তৈরি করেন, যে জন্য এই বৃত্তের বাইরে তাঁদের একক অস্তিত্ব অর্থহীন।

সমকালীন কবিদের জন্য, সোচ্চার উত্তেজনায় এরকম একটি সহযাত্রীদের বৃত্ত তৈরি করেছিলেন 'কৃত্তিবাস পত্রিকার (১৩৬০ শ্রাবণ) কবিরা। প্রথম সংখ্যার অস্বাক্ষরিত একটি রচনায়, উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে সম্পাদকরা জানিয়েছিলেন, 'একেবারে তরুণদের সার্থক না হল্যে ভালো নতুন কবিতার গতিপথের একটা নিরিখ' তাঁরা তুলে ধরতে চান 'বাংলাদেশের তরুণতম কবিদের 'মুখপত্র' এই 'কৃত্তিবাস' - এর মাধ্যমে। যেহেতু, কবি হিসেবে যাঁরা প্রথম সংখ্যায় উপস্থিত, তাঁদের অনেকে তখনই বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় প্রচারিত হয়েছেন, তবু একটা নতুন কাগজ কেন? 'যদি তাঁদের স্বকীয়তা থাকে তবে নিজের দীপ্তিতে তাঁরা তো মনোযোগ আকর্ষণ করবেনই সুতরাং পৃথক কাগজের কি প্রয়োজন?' এরকম একটি প্রশ্ন উঠতে পারে অনুমান করে উত্তরে বলা হয়েছিল 'অনেককে এক জায়গায় দেখলে নতুন কবিতার চেহারাটা সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে চোখে পড়ে। তাছাড়া, কবিদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে, এবং পারস্পরিক বন্ধুত্ব যতো দৃঢ় হয় লেখায় আত্মস্বতন্ত্রতা ততো বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন তরুণদের বিক্ষিপ্ত কাব্যপ্রচেষ্টাকে সংহত করলে - বাংলা কবিতায় প্রাণছন্দের উত্তাপ নতুন আবেগে এবং বলিষ্ঠতায় জাগতে পারে এবং সকলের মধ্যে প্রত্যেকরই কণ্ঠস্বরকেই আলাদা করে চেনা যেতে উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয়েছিল, যা পঞ্চাশ দশকের গড়ে - ওঠা দল বা গোষ্ঠী সম্পর্কে অনেক রোমাঞ্চকর ও মুখরোচক গল্পের সৃষ্টি করেছে। অন্তত, প্রধান দু-চারজন কবির ব্যক্তিগত জীবন - যাপন এতটা উচ্ছৃঙ্খলতায় উচ্চকিত, কবিতাপ্রেমী সাধারণ পাঠকরা এই জীবন - যাপনকে কবিতা প্রচারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে ভেবেছিলেন। আর সে ভাবনা প্রায় আক্ষরিক অর্থে একনো বিদ্যমান, না হলে উনিশ'শ তিরাশি সালের আকাদেমি পুরস্কার প্রাপক পঞ্চাশ - দশকের শক্তিমান কবিকে তাঁর জনপ্রিয়তার স্বীকৃতি হিসেবোও 'এক পাত্র সুধা' নামের একটি বিচিত্র উপহার তুলে দেওয়া হল, বিগত বই মেলায়। হয়তো বাংলা কবিতা, প্রচারেরবিচিত্রতম মুহূর্ত স্পর্শ করলো এই ঘটনার ভিতর দিয়ে। একথা সত্যি যৌবনের ধর্মই তো বিদ্রোহ ঘোষণা করা, যা কিছু প্রথাসিদ্ধ তার অনুকরণ না করে, ভেঙ্গে নতুন করে পথ তৈরি করাই যুবকের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কবিতার নামে এই যৌবন যদি জীবনের প্রতি অত্যাচার হয়ে ওঠে, সেখানে জীবনের প্রচার হয়তো ত্বরান্বিত হতে পারে কিন্তু কবিতার পথ একটা জায়গায় আটকে যেতে বাধ্য।

'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রদান উপলক্ষ্য ছিল, 'বিভিন্ন তরুণদের বিক্ষিপ্ত কাব্য - প্রচেষ্টাকে' সংহত করা। মধ্য ষাট দশকে 'শ্রুতি' নামের এক ক্ষীণকায় পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কবিতায় এক নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছিল; এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্থির করে তাঁরা জানিয়েছিল এক দঙ্গল কবির পাঠ্য অপাঠ্য রাশি রাশি কবিতা ছাপিয়ে সাহিত্য সমাজে সামাজিকতা করার উদ্দেশ্য শ্রুতির নেই। 'শ্রুতির' কিছু নির্দিষ্ট লেখক আছে, আর কবিতার স্পষ্ট নিজস্বতা এবং ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও তাঁদের কবিতাবিষয়ক বিশ্বাস ও চিন্তার কিছু মিল রয়েছে। এরই ভিত্তিতে এসব তরুণ কবি এ সময়ে কবিতার অক্ষম কলেবর এবং অশিক্ষিত হুজুগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাব্য আন্দোলনের প্রয়াসী। শ্রুতি এই প্রচেষ্টার নাম। ষাট - দশক জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে আমরা আরও দুচারটে আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। ক্ষুধার্ত কিংবা ক্রোধীদের কবিতা, কিংবা ধ্বংসকালীন কবিতার আন্দোলন হিসাবে সে সব চিহ্নিত। ক্ষুধার্ত বা হাংরি জেনারেশনের কবিদের একটা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীরই একটা ভাঙাদল সাময়িকভাবে এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নানা ভাঙচুরের মধ্যেও মলয় রায়চৌধুরী এখনো তাঁর হাংরি আন্দোলনের পরিচয় গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে, স্মরণ করা যেতে পারে, বছর ছ-সাত ধরে কলকাতায় সরকারি উদ্যোগে বিশাল আয়োজনে কবিতা উৎসব নামের কাব্য পাঠের অনুষ্ঠান নিয়মিত হয়ে চলেছে। প্রথম বছর থেকেই প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে একটা বড়ো বিতর্ক দেখা দিয়েছিল- অবশেষে জাঁকজমক সত্ত্বেও - প্রকৃতপক্ষে কবিতাকে জনপ্রিয় করবার সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। হয়তো যোগ্য নেতৃত্ব পেলে এই ধরনের অনুষ্ঠান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটা দীর্ঘস্থায়ী মাত্রা পেতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

জীবনানন্দ কবিতার প্রচারের কথা বলতে গিয়ে বছর পঁয়তাল্লিশ পূর্বে অন্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন, জনতার হাজার হাজার বর্গমাইলের দিকে তাকিয়ে খ্রিষ্টান পাদরিরা যেমন বাইবেল বিতরণ করেন, শ্রেষ্ঠ কবিতা সে ভাবে বিতরিত হবার জিনিস নয়। এখন হয়তো কিছুটা স্তিমিত, কিন্তু ষাট দশকের সূচনায়, মূলত রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষকে উপলক্ষ করে বাংলা কবিতার প্রচার একটা সর্বাত্মক ব্যাপকতার আকার নেয়, যার ফলে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, পত্রিকায় - পত্রিকায় ছয়লাপ হয়ে গিয়েছিল বাংলার, বিশেষত কলকাতার রবীন্দ্র জন্মতিথি। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের পঁচিশে বৈশাখ পনেরো পয়সা মূল্যে একটি 'দৈনিক কবিতা' নামের পত্রিকা কাব্য - পাঠকদের সামনে একটা আলোড়ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। উদ্যোক্তারা লিখেছিলেন 'দৈনিক কবিতা প্রকাশিত হলো' 'পৃথিবীর প্রথম কবিতা দৈনিক' আমাদের বহু বিজ্ঞাপিত এ দাবী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর খুব সম্প্রতি বিশ্বস্তসূত্রে আমরা জানতে পারলাম যে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিত প্রতি বসন্তকালে একটি দৈনিক প্রকাশিত হয়। ইংল্যান্ড থেকেও এ ধরনের একটি কবিতা দৈনিকের খবর আমাদের গোচরে এসেছে। বর্তমান কবিতা দৈনিককে তাই পৃথিবীর প্রথম বলা যায় না। সেই হিসেবে তৃতীয় বা চতুর্থ সারিতে এর স্থান।' প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন্তব্য 'কবিতা দৈনিক হয় না' দিয়ে পত্রিকাটার সূচনা। প্রেমেন্দ্র মিত্র জানিয়েছিলেন 'কবিতার দৈনিক - এর কথা শুনে কিছুটা যেমন বিস্মিত তেমনি শঙ্কিতও যে হয়েছি তা অস্বীকার করব না। এ উৎসাহকে বাজে হুজুগ বলে নিজে যদি নাও করি তবু এ ঢেউ থামবে কোথায় তা নিয়ে একটু দুর্ভাবনা হয় বই কি।' তাঁর মন্তব্যের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি এও জানিয়েছিলেন 'কবিতা নিয়ে মাতামাতিই যদি করতে হয়, মাতাতে হয় যদি দেশের মানুষকে উৎসব গোছের কিছুতে, তাহলে 'বাঁধা রাস্তায় গোনা পা ফেলে তা কি সম্ভব। মাত্রা তো তাতে কিছু ছাড়াবেই, সে মাত্রা ছাড়ানো বাতুলতা এ উৎসবের আসল বা উৎস সেই কবিতাই না নোংরা করে এই টুকু শুধু সাবধান হবার।'

দিনে দিনে নিয়মিত প্রকাশ করে পঞ্চদশ সংখ্যায় তাদের এ ধরনের উদ্যোগের সার্থকতা বা ব্যর্থতা কোথায় সে প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেরাই উত্তর দিয়েছিলেন 'আমরা চেয়েছিলাম সাধারণ পাঠকের সঙ্গে কবিতার একটি যোগসূত্র স্থাপন করা এবং ব্যাখ্যাধর্মী গদ্য রচনার মধ্য দিয়ে তারি সংযোগ সঞ্চার করতে পারি তাহলে পাঠক পরবর্তী কালে নিজেই পাঠযোগ্য কবিতা যথাস্থানে যথাকালে আবিষ্কার করে নিতে পারবেন, সে কৃতিত্ব এবং আনন্দ তখন তাঁর নিজেরই প্রাপ্য।' স্মরণ করা যেতে পারে এসময় 'অমৃত পত্রিকায় এই উদ্যোগ সম্পর্কে কটাক্ষ করে লেখা হয়েছিল 'বাংলার প্রধান প্রধান কবিরা তো বটেই, এইসব অন্তহীন সাপ্তাহিক, দৈনিক, ঘন্টিকে যাঁদের রচনা প্রকাশিত হচ্ছে, তাঁদের মধ্যেও যাঁরা শক্তিমান কবি, তাঁরা জানেন, কবিতার জনপ্রিয়তা নয়, নিছক একটু মজা করবার জন্যেই প্রকাশিত হচ্ছে ঐ কাগজগুলি। ফাঁকতালে যাঁরা অকবি, তাঁরা একটু নিজের ঢাক পিটিয়ে নিচ্ছেন মাত্র।'

নানা আকারের অজস্র ক্ষীণজীবী পত্র - পত্রিকা, কবিতা প্রচারের আতিশয্যে মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিনে দিনে এমনকি ঘন্টায় - ঘন্টায় কবিতার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। যিনি আজীবন কবিতাপ্রেমিক হিসেবে পরিচিত, সেই বুদ্ধদেব বসুও এইসব প্রচেষ্টার দিকে তাকিয়ে খুব ক্লান্ত কণ্ঠে পরিহাস - মিশ্রিত প্রশ্ন রেখেছিলেন 'আর কোন দেশে 'কবিতা' এমন বিসূচিকার মহামারীর মতো প্রাদুর্ভূত হয়, যা রোমকূপ থেকে ঘামের মতো, অথবা সুস্থ যুবকের বৃক্ক থেকে মূত্রের মতো মেন অনর্গল বেরিয়ে আসে, তা কি তোমরা বলতে পারো?'

বুদ্ধদেবের এই পরিহাস খুব সাঙঘাতিক অপবাদের মতো মনে হলেও, এ কথা সত্যি, এত লক্ষ লক্ষ কবিতার ভিতর অনেকভালো কবিতাও লেখা হয়েছে, হচ্ছে। বিগত কয়েক দশকে অনেক শক্তিমান তরুণ আর্বিভূত হয়েছেন, আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু এই আবির্ভাবকে সর্বজন স্বীকৃত করে তোলার জন্য যে নেতৃত্ব ও উচ্চকণ্ঠ গোষ্ঠীর প্রয়োজনতা গড়ে ওঠেনি, ফলে ভিড়ের ভিতরে হারিয়ে যাচ্ছেন প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন অনেকেই, একটা উঁচু জায়গা দরকার - সমতলের ভিড় থেকে সেখানে এইসব নবীনদের স্বাগত জানাতে হবে, একেবারে নতুনদের মধ্যেই কাউকে এই দায়িত্ব নিতে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে প্রকৃত কবির সঙ্গে প্রকৃত পাঠকের মেলবন্ধন ঘটানোর। মনে করা যেতে পারে প্রায় আটচল্লিশ বছর আগে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কবিতার বোঝাপড়া' শীর্ষক একটি গদ্যে লিখেছিলেন আসলে আজকের লেখক আর পাঠকের মধ্যে বিস্তর ভুল বোঝাবুঝি আছে। দুপক্ষকে একটা বোঝাপড়ার মধ্যে আনা দরকার। মাঝখানে মান - অভিমান যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।' স্বভাব সুন্দর গদ্যে তিনি লিখেছিলেন কবিতার দুদিকে দুটো ডানা। একদিকে লেখক, অন্যদিকে পাঠক। কোনো একটা ডানা কেটে গেলে কবিতা আর ওড়া হয়না। কী লেখক কী পাঠ, একের অন্যকে না হলে চলে না। লেখা মানেই কথা বলা। কবিতাও কথা বলার একটা ধরন। না বললে যেমন কথা হয় না, তেমনি না শুনলেও কতা হয় না।' একেবারে উপসংহারে তিনি বলেছিলেন 'আসলে কবিতাকে দুচোখ বেয়ে চলতে হয়। একটা চোখ কবির। একটি চোখ পাঠকের। কবিকেও যেমন নিছক কবি হয়ে এক চোখে দেখলে চলে না। পাঠককেও তেমনি নিছক পাঠক হিসেবে এক চোখে হয়ে থাকা চলে না। কবি আর পাঠকের চোখাচোখি হওয়ার মধ্যেই থাকে কবিতার বোঝাপড়া' এই বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই কবিতার প্রতিষ্ঠা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, সে দায় বহন করবেন এমন নেতার খুব দরকার।

Baisakhi – Kabita – Short – Sai Ghar - Anando Ghosh Hajra
বৈশাখি - সেই ঘর - আনন্দ ঘোষ হাজরা

সেই ঘর কারো কারো চেতনাপ্রবাহে লীন থেকে যাবে;
শরীর যখন যাবে এনট্রপির সমূহ সংঘাতে -
সেই ঘর বিন্দুবৎ ছোট হতে, ছোট হতে হতে
মহাসাগরের ঢেউয়ে চূড়ায় চূড়ায় জ্বলে উঠবে কতবার -
কতক্ষণ তৃপ্তি পাবে এই সব দৃশ্য দেখে
অধস্তন কয়েক পুরুষ।
সেই আঙিনায় আলোছায়া খেলা করে উঠবে, কোনো
ভাসমান ক্ষেত্রকাল জুড়ে;
সেই বিকেলের ঘন্টাধ্বনি, লাজুক ভঙ্গিতে চলে গেলে
পূর্ব ও পশ্চিম খোলা উত্তর ও দক্ষিণ খোলা সেই মেঠো ঘর
নতুন খড়ের দীপ্তি মাথায় চাপিয়ে নিয়ে অবনঠাকুর
অবিচ্ছিন্ন চেতনার সারাংশে মিশেই থাকবে
আকাশ গঙ্গার বুকে জুড়ে;
যারা তাকে দেখতে পাবে মাঝে মাঝে
তাদের পরম ক্ষণটুকু
আমি অনুভব করি, মুগ্ধ হই, ধন্য হয়ে উঠি।

Baisakhi – Kabita – Short – Bastubiswo – Jasodhara Roychudhuri
বৈশাখি - বস্তুবিশ্ব - যশোধরা রায়চৌধুরী

।। টেবিল।।
টেবিল বহুপ্রকার। সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য, লেখার।
লেখার টেবিল একটি পেয়ে উঠতে কত পরিশ্রম হয়ে গেল
লেখার টেবিল একটি অর্জন। প্রথমত, সঠিক উচ্চতা।
তারপর, পরিসর। তারপর, ভিড় জমে ওঠা।
তারও পর - লেখাপত্র হওয়া। দৈববৎ।
নিজস্ব ও প্রিয় লেখার টেবিলে বসতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথীয়
'পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে...
অন্যত্র টেবিলগুলি ছোটোখাটো, সরল, নিষ্পাপ।
ঈষৎ ছেনালও। কেউ ছাইদান রাখে, কেউ জল,
মাথা ধরার ট্যাবলেট।